স্বাস্থ্য সংলাপ

icddr,b

পারকিনসন্স ডিজিজ

সরদার আব্দুল হাসিব, হেলথকেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড

পারকিনসন্স ডিজিজ বা সংক্ষেপে পিডি (PD) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের একটি রোগের নাম, যা মস্তিস্কের মধ্য-অঞ্চলের স্নায়ুকোষের মৃত্যুর কারণে হয়ে থাকে। অ্যালজেইমার (alzheimer) রোগের পরে এটিই হলো বিশ্বের দ্বিতীয় প্রাণঘাতী স্নায়ুতন্ত্রের রোগ। ১৮১৭ সালে ইংরেজ ডাক্তার জেমস পারকিনসন তাঁর "An essay on the shaking palsy" নিবন্ধে সর্বপ্রথম এই রোগ সম্পর্কে তথ্য দেন। পরবর্তীতে তার নাম অনুসারেই এই রোগের নামকরণ করা হয়। পারকিনসন্স ডিজিজের প্রাথমিক কারণ হিসেবে মধ্য-মস্তিস্কের সাবস্ট্যানশিয়াল নাইগ্রা (substantial nigra) অঞ্চলের ডোপামিন (dopamine) প্রস্তুতকারী স্নায়ুকোষের মৃত্যুকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই রোগের প্রাথমিক পর্যায়ের উপসর্গের মধ্যে রয়েছে চলাফেরা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া করতে সমস্যা, যেমন হাত-পায়ের কাঁপুনি, হাত-পা নাড়াতে না-পারা ও ধীরগতিতে চলাচল।

উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো, সারাবিশ্বে প্রায় ১ কোটি মানুষ পারকিনসন্স ডিজিজে আক্রান্ত, যাদের মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ১০ লক্ষ এবং ইউরোপের ১২ লক্ষ মানুষ। বাংলাদেশে প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ এ-রোগে ভুগছে। প্রতিবছর বিশ্বে প্রায় ৫০,০০০ মানুষ এ-রোগের কারণে মৃত্যুবরণ করে। সাধারণত পারকিনসন্স ডিজিজে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়তে থাকে। পঞ্চাশ বছর বা তার বেশি বয়সের মানুষের মধ্যে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। তবে, কম-বয়সের মানুষেরও এই রোগ হতে পারে। এখন পর্যন্ত এ-রোগের কোনো প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয় নি।

রোগের লক্ষণ ও উপসর্গ

পারকিনসন্স ডিজিজ একটি জটিল শারীরিক অবস্থা যা মানুষকে বিভিন্নভাবে আক্রান্ত করে। এই রোগের সবচেয়ে সাধারণ উপসর্গ হলো চলাফেরা এবং হাত ও পায়ের অস্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ, যাকে মটর সিম্পটোম্পস বলে। এ-রোগের অন্যান্য উপসর্গের মধ্যে আছে চিন্তাধারা, আচার-ব্যবহার, ঘুম এবং বোধশক্তির পরিবর্তন। এগুলোকে নন-মটর সিম্পটোম্পস বলে। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অনেক সময় পিডি-আক্রান্ত রোগীর লক্ষণ ও উপসর্গ ব্যক্তিভেদে আলাদা হয়ে থাকে। রোগীর মধ্যে অনেক সময় সাধারণভাবে যেসব লক্ষণ দেখা দেওয়ার কথা সেগুলো না-ও দেখা দিতে পারে। তবে, রোগীর যেসব সমস্যা দেখা যায় সেগুলো দিনদিন অবনতির দিকে যেতে থাকে। উপসর্গগুলোকে নিম্নোক্ত প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যেগুলো আক্রান্ত ব্যক্তির জীবনযাত্রাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে:

১. **ট্রেমর (tremor):** হাত স্বাভাবিক থাকা অবস্থায় হাতের অনিয়ন্ত্রিত কম্পন হতে থাকে। অনেক সময় রোগী হাতের কম্পনকে

পারকিনসন্স ডিজিজে আক্রান্ত রোগীরা এভাবে ঝুঁকে হাঁটে

ভেতরের পাতায়

- হাইপোগ্লাইসেমিয়া
- হাম, মাম্পস ও রুবেলা প্রতিরোধে আমাদের করণীয়
- ডায়াবেটিস রোগীদের পায়ের যত্ন

বর্ষ ২৩ | সংখ্যা ১

শ্রাবণ ১৪২১ | আগস্ট ২০১৪

ISSN 1021-2078

icddr,b

আইসিডিডিআর,বি উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কলেরাসহ ডায়রিয়াজাতীয় রোগের ওপর গবেষণা, এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে পাক-সিয়াটো কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামে ঢাকার মহাখালিতে যে-প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে, মূলত সে-প্রতিষ্ঠানই ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে তার বর্তমান নাম ধারণ করে। এ-প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও সেবাদান-সংক্রান্ত কর্মপরিধি এখন আর কেবল ডায়রিয়াজাতীয় রোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশু-স্বাস্থ্য, প্রজনন-স্বাস্থ্য, পুষ্টি বিজ্ঞান, সংক্রামক ব্যাধি ও টিকাবিষয়ক বিজ্ঞান, ক্রনিক ও অসংক্রামক রোগ, এইচআইভি/এইডস, স্বাস্থ্যের ওপর দারিদ্র্যের প্রভাব, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা-বিষয়ক কর্মকাঠামো, জেন্ডার স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার আইসিডিডিআর,বি-র গবেষণা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডায়রিয়া রোগীর জীবন রক্ষাকারী খাবার স্যালাইনের আবিষ্কার ও উন্নতমানের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আইসিডিডিআর,বি পৃথিবী বিখ্যাত।

স্বাস্থ্য সংলাপ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক	জন ক্লিমেন্স
উপ-প্রধান সম্পাদক	প্রদীপ কুমার বর্ধন
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক	মোঃ সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
সম্পাদক	সৈয়দ হাসিবুল হাসান

সদস্য

রুখসানা গাজী, মোঃ ইকবাল, মাসুমা আক্তার খানম, রুবহানা রকিব ও মাখদুম আহমেদ

সহযোগিতায়	হামিদা আক্তার
পৃষ্ঠাবিন্যাস	সৈয়দ হাসিবুল হাসান

কারা স্বাস্থ্য সংলাপ পেতে পারেন

যেকোনো পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী, পল্লী-চিকিৎসক, সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারসমূহে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সংলাপ পাঠানো হয়। স্বাস্থ্যকর্মী হলে আপনার নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান এবং পূর্ণ ঠিকানা সম্পাদক বরাবর ডাকযোগে বা ইমেইল-এর মাধ্যমে লিখে পাঠান। সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অবশ্যই সীলমোহরযুক্ত দাপ্তরিক প্যাডে আবেদন করতে হবে।

প্রকাশক

আইসিডিডিআর,বি
মহাখালি, ঢাকা ১২১২
(জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০), বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০২) ৮৮২২৪৬৭, ৯৮২৭০০১-১০
ফ্যাক্স: (৮৮০২) ৮৮১৯১৩৩, ৮৮২৩১১৬
ইমেইল: hasib@icddrb.org

কোনো লেখায় ব্যক্ত মতামতের জন্য প্রকাশক বা সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী নন

মুদ্রণ: প্রিন্টলিঙ্ক প্রিন্টার্স, ঢাকা

কখনো বন্ধ করতে পারে না, অবিরাম চলতে থাকে।

২. **ব্রাডিকাইনেসিয়া (bradykinesia):** অত্যন্ত ধীর গতির চলাফেরা, যেক্ষেত্রে শারীরিক গতিবিধি খুবই মন্থর হয়ে থাকে। এই অবস্থায় অসুস্থ ব্যক্তি দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে সমস্যার সম্মুখীন হয়। উদাহরণস্বরূপ, ধীরগতিতে হাঁটা, জিনিসপত্র ধরতে সমস্যা-হওয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৩. **রিজিডিটি (rigidity):** আক্রান্ত ব্যক্তির মাংসপেশী শক্ত হয়ে যায়, যা তার চলাচলকে আরও বাধাগ্রস্ত করে তোলে। কখনো কখনো রোগীর মুখমণ্ডলের আকৃতির পরিবর্তন হয়ে যায় এবং পেশীতে অসহনীয় ব্যথা অনুভূত হয়।

রোগের কারণ

পারকিনসন্স ডিজিজের সঠিক কারণ বা কেন এই রোগ হয়ে থাকে তা এখনো অজানা রয়ে গেছে। তবে, বিভিন্ন গবেষণা থেকে ধারণা করা গেছে যে, স্নায়ুকোষের মৃত্যুর কারণ হলো নিউরনে উপস্থিত একধরনের প্রোটিন আলফা-সাইনুক্লিন (alpha-synuclein)-এর দ্রাব্যতা (solubility) হ্রাস-পাওয়া। এই প্রোটিন সাধারণত কোষের ভেতরে স্বচ্ছ ও দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। কিন্তু রোগাক্রান্ত অবস্থায় এই প্রোটিন তন্তুর মতো হয়ে যায়। আর এই তন্তুগুলো একত্রিত হয়ে লিউই বডি (lewy body)-নামক অদ্রবণীয় ঘণীভূত বস্তুতে পরিণত হয়। এক পর্যায়ে স্নায়ুকোষ মারা যায়। যার ফলস্বরূপ পিডি-র লক্ষণ দেখা দেয়।

গবেষকরা এই রোগ হওয়ার প্রবণতার জন্য জিনগত, পরিবেশগত ও জৈবিক কারণ চিহ্নিত করতে পেরেছেন।

জিনগত কারণ: পারকিনসন্স ডিজিজ জিনগত রোগ না-হলেও ১৫ শতাংশ মানুষের এই রোগ হয়ে থাকে যাদের নিকট আত্মীয়ের মধ্যে এই রোগ আছে বা ছিলো। কিছু নির্দিষ্ট জিনের পরিবর্তনের কারণে এই রোগ হতে পারে। জিনগুলোর মধ্যে SNCA এবং PRKM অন্যতম।

পরিবেশগত কারণ: আমাদের পরিবেশের প্রভাবের কারণে এই রোগ হতে পারে, যেমন ক্ষতিকারক পদার্থের সংস্পর্শে থাকার কারণে পিডি হতে পারে এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে। দীর্ঘসময় কীটনাশকের ব্যবহার বা সংস্পর্শ এ-রোগে আক্রান্ত হওয়ার হার বাড়িয়ে দেয়। পারকিনসন্স ডিজিজে আক্রান্ত ব্যক্তির মস্তিস্ক থেকে জৈব ক্লোরিনের সমন্বয়ে তৈরি কীটনাশকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। তবে কোন সুনির্দিষ্ট মাত্রার কীটনাশক এর জন্য দায়ী তা এখনও জানা যায় নি।

মস্তিষ্কে ধাতব আয়নের পরিমান বৃদ্ধি পেলেও এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। এসব ধাতব আয়ন পরিবেশ থেকে আমাদের শরীরে আসতে পারে। বিভিন্নভাবে পরিবেশ দূষণ বায়ুমণ্ডলে ক্ষতিকারক আয়নের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। দেখা গেছে, কিছু নির্দিষ্ট ধাতব আয়ন অতিরিক্ত পরিমাণে মস্তিস্কে জমা হলে বা এগুলোর অনুপাতের তারতম্য হলে পারকিনসন্স ডিজিজের উপসর্গ দেখা দেয়। গবেষকরা পিডি রোগীদের মস্তিস্কে লৌহ (ferrus) এবং তামা (copper) আয়নের অতিমাত্রায় উপস্থিতি সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। এসব ধাতব আয়নের অতিমাত্রায় উপস্থিতি স্নায়ুকোষের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতায় বাধা সৃষ্টি করে। কোষ বিভিন্ন এনজাইম ও প্রোটিনকে জারিত (oxidize) করে এবং পর্যায়ক্রমে কোষ মৃত্যুর পথে ধাবিত হয়।

Molecular biological পরিবর্তন: RNA থেকে প্রোটিন তৈরি হওয়ার পর এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এবং রাইবোজোমে পরিবর্তিত হয়ে থাকে, যাকে post-transitional modification বলা হয়। আলফা-সাইনুক্লিন প্রোটিনের এই পরিবর্তন হলে এটি দ্রবীভূত অবস্থা থেকে তন্তুর মতো হতে পারে, যা পর্যায়ক্রমে পারকিনসন্স রোগের সৃষ্টি করে। আলফা-সাইনুক্লিনের অ্যামাইনো এসিড চেইনের সাথে যদি ফসফেট গ্রুপ যুক্ত হয়ে যায় তাহলে প্রোটিনটি তন্তুর মতো হয়ে যায়, যা স্নায়ুকোষের জন্য ক্ষতিকারক এবং পরবর্তীতে কোষের মৃত্যু ঘটাতে পারে।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

যদিও পারকিনসন্স ডিজিজের কোনো নিরাময় নেই, তবুও এর চিকিৎসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। সঠিক চিকিৎসা রোগের বিস্তারকে বিলম্বিত করে। আর তা না-হলে রোগীর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পর্যায়ক্রমে পক্ষাঘাতগ্রস্ত (paralysis) হয়ে যায় এবং রোগী শেষ পর্যন্ত মারা যায়। এই রোগের চিকিৎসা কয়েকটি পর্যায়ে হয়ে থাকে। রোগের উপসর্গ অনুসারে এগুলোর প্রয়োগ নিম্নরূপ:

১. **ওষুধ:** ওষুধ সেবনের মাধ্যমে মূলত পারকিনসন্স রোগীদের উপসর্গ নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। মস্তিষ্কের কয়েকটি নির্দিষ্ট জৈব রাসায়নিক পদার্থের অভাবে এর প্রাথমিক উপসর্গ দেখা যায়, যার মধ্যে ডোপামিন অন্যতম। ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে এই পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। লিভোডোপা হলো এমন একটি ওষুধ।

২. **ফিজিওথেরাপি:** পারকিনসন্স ডিজিজে চলাচলে বাধা ও কাঁপুনি দেখা দেয় বলে ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে রোগীদের অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব। ফিজিওথেরাপিস্টরা রোগীদের সহজ চলাফেরা বা হাত ও পায়ের কাঁপুনি কমানোর জন্য বিশেষ ব্যায়ামের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এগুলো অনুশীলন করলে রোগীর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয় এবং এগুলো রোগীর দৈনন্দিন কর্মক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

৩. **মস্তিষ্কের শল্যচিকিৎসা:** রোগের উপসর্গ কমাতে শল্যচিকিৎসা কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। যখন রোগের উপসর্গ নিয়ন্ত্রণে ওষুধ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না তখন শল্যচিকিৎসা করা হয়। মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করা হলে রোগীর কাঁপুনিজনিত অবস্থার ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিয়ন্ত্রণে উন্নতি ঘটে। এরপরও ওষুধ খেতে হয়। তবে, শল্যচিকিৎসার আগের অবস্থা থেকে অনেক কম পরিমাণে ওষুধ খেতে হয়। ফলশ্রুতিতে ওষুধ সেবনের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া কমে আসে।

শল্যচিকিৎসার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। রোগীর দেহের অন্যান্য অংশে সমস্যা থাকলে, যেমন হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস এবং কিডনিতে সমস্যা থাকলে মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দেওয়া হয় না। শল্যচিকিৎসা রোগের উপসর্গ ও ব্যাপ্তির ওপর বিবেচনা করে কয়েক ধরনের হয়ে থাকে। প্রধান চিকিৎসাগুলোর মধ্যে ডিপ ব্রেইন স্টিমুলেশন (deep brain stimulation), প্যালিডোটমি (pallidotomy) এবং থ্যালামটমি (thalamotomy) উল্লেখযোগ্য। ডিপ ব্রেইন স্টিমুলেশনের মাধ্যমে মস্তিষ্কের যে নির্দিষ্ট অংশের জন্য পারকিনসন্সের উপসর্গ দেখা দেয় সেই অঞ্চলে বিদ্যুতের ঝটকা দেওয়া হয়। যেসব রোগীর শারীরিক অবস্থা গুরুতর পর্যায়ে চলে যায় তাদের এই চিকিৎসা দেওয়া হয়। আর প্যালিডোটমি এবং থ্যালামটমি হলো মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র অংশ বিনাশ করে দেওয়া যা পিডি-র জন্য দায়ী।

প্রতিরোধ

পারকিনসন্স ডিজিজ প্রতিরোধের কোনো সুনির্দিষ্ট উপায় এখন পর্যন্ত জানা যায় নি। তবে, বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যাফেইন সেবনকারীদের মধ্যে এই রোগের ঝুঁকি কম থাকে। এছাড়া, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যেমন ভিটামিন সি এবং ভিটামিন ডি-সমৃদ্ধ খাদ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে খেলে এই রোগের ঝুঁকি কমে যায়। তবে, এসব তথ্যের পক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণ এখনো পাওয়া যায় নি।

পারকিনসন্স ডিজিজে আক্রান্ত রোগীর হাত সারাক্ষণ কাঁপতে থাকে

ভবিষ্যৎ চিকিৎসা

পিডি নিরাময় করার লক্ষ্যে বর্তমানে বিশ্বের অনেক গবেষক অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন। বেশিরভাগ গবেষক কিভাবে মস্তিষ্কে ডোপামিনের পরিমাণ বাড়ানো যায় সেই লক্ষ্যে কাজ করছেন। গবেষণার ফলে যেসমস্ত পদ্ধতি এর উপসর্গগুলো উপশমে কার্যকর বলে প্রতীয়মান হয়েছে সেগুলো হলো:

১. **স্নায়ুকোষ প্রতিস্থাপন চিকিৎসা:** পিডি রোগীর শারীরিক অবস্থার উন্নতির জন্য মধ্য-মস্তিষ্কে স্নায়ুকোষ প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে। এ-পদ্ধতিতে ডোপামিন প্রস্তুত করতে সক্ষম ভ্রূণের স্নায়ুকোষ রোগীর মস্তিষ্কে প্রতিস্থাপন করা হয়। তখন প্রতিস্থাপিত কোষ থেকে ডোপামিন উৎপন্ন হতে থাকে। এই চিকিৎসার অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। প্রত্যেক প্রতিস্থাপনের জন্য ৪-১০টি ভ্রূণ প্রয়োজন, যা দুষ্প্রাপ্য ও নৈতিকতা বিরোধী। তাছাড়া এ-চিকিৎসার সাফল্যের হারও প্রায় পঞ্চাশ শতাংশের মতো, যা যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক নয়।

২. **জিন থেরাপি:** জিন থেরাপি নতুন একটি পদ্ধতি, যেক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট জিনকে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করে রোগ নিরাময় করা যায়। পিডি-র জন্য জিন থেরাপীর মাধ্যমে স্নায়ুকোষের মৃত্যু প্রতিরোধ করে নতুন কোষ তৈরি করা যেতে পারে।

৩. **স্টেম সেল:** স্টেম সেল হলো বিশেষ এক ধরনের কোষ যা শরীরের বিভিন্ন ধরনের কোষ, যেমন ত্বক, রক্ত, স্নায়ুকোষ ও হাড়ের কোষের পুনরুদ্ধার এবং বৃদ্ধি করতে পারে। স্টেম সেল যেসব কোষকে পুনরুদ্ধার করে তা অনেক বেশি স্থায়ী ও শরীরের ক্রিয়াকলাপে অনেক বেশি কার্যকর। এখন এই কোষ থেকে ডোপামিন প্রস্তুতকারী স্নায়ুকোষ তৈরির বিষয়ে গবেষণা চলছে, যা পিডি রোগীর মস্তিষ্কে কোষ স্থানান্তরের মাধ্যমে রোগ নিরাময় করবে। এই গবেষণা সফল হলে এই রোগের প্রকৃত এবং স্থায়ী চিকিৎসা সম্ভব হবে।

পারকিনসন্স ডিজিজ একটি অপ্রতিরোধ্য ও যন্ত্রণাদায়ক রোগ হিসেবে পরিচিত। আগামী বছরগুলোতে রোগটি আরো ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করতে পারে। এখনই এর বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি না-করতে পারলে চরমভাবে মূল্য দিতে হতে পারে। এর জন্য চিকিৎসক, ফিজিওথেরাপিস্ট এবং নিউরো-গবেষক সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। এছাড়াও, সম্পূর্ণভাবে পিডি নিরাময়ের জন্য ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন। ■

হাইপোগ্লাইসেমিয়া

ডাঃ মোঃ ফজলুল কবির পাভেল
পাবনা মেডিকেল কলেজ

ডায়াবেটিস রোগীর রক্তে গুকোজ অতিরিক্ত কমে গেলে সেই অবস্থাকে হাইপোগ্লাইসেমিয়া বলে। হঠাৎ করে যদি ডায়াবেটিস রোগী অজ্ঞান হয়ে যায় তবে সর্বপ্রথম হাইপোগ্লাইসেমিয়ার কথা মাথায় রাখা উচিত। ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেশি থাকে। অনেক সময় হঠাৎ করে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে গিয়ে হাইপোগ্লাইসেমিয়ার ফলে বিপত্তির সৃষ্টি হয়। এসময় যদি সঠিক চিকিৎসা না-করা হয় তবে রোগীর মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। হাইপোগ্লাইসেমিয়া হলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ ২.৫ মিলিমোল/লিটার-এর কম হয়ে যায়।

হাইপোগ্লাইসেমিয়ার অনেক কারণ আছে। তবে, সাধারণ কিছু কারণ আছে যার জন্য হাইপোগ্লা-ইসেমিয়া বেশি হয়। যেমন:

- অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম করা
- কোনো বেলার খাবার না-খাওয়া বা খেতে দেরি করা
- ইনসুলিনের ডোজ বেশি নেওয়া
- ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের ওষুধ বেশি পরিমাণে খাওয়া
- অতিরিক্ত অ্যালকোহল পান করা
- লিভার বা কিডনিতে সমস্যা থাকা

হাইপোগ্লাইসেমিয়াকে মৃদু, মধ্যম ও তীব্র এই তিনভাগে ভাগ করা হয়। তীব্র হাইপোগ্লাইসেমিয়া খুবই বিপদজনক। তীব্র হাইপোগ্লাইসেমিয়ায় দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা না-হলে রোগীর মৃত্যুও ঘটতে পারে।

হাইপোগ্লাইসেমিয়ার রোগীদের বিভিন্ন উপসর্গ

- অস্বস্তিবোধ
- অস্থিরতা
- ঘাম-হওয়া
- বমিভাব বা বমি
- বুক ধড়ফড় করা
- বিভ্রান্তি
- তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব
- জ্ঞান হারিয়ে ফেলা
- অস্পষ্টভাবে কথা বলা
- মাথাব্যথা

গ্লুকোমিটারের সাহায্যে খুব সহজে বাড়িতে বসেই ডায়াবেটিস নির্ণয় করা যায়

- হঠাৎ তীব্র ক্ষুধা-লাগা
- হঠাৎ ভাবাবেগ বা আচরণের পরিবর্তন
- হাত-পা কাঁপতে থাকা
- খিঁচুনি হওয়া
- দেখতে সমস্যা হওয়া, ইত্যাদি।

সব রোগীরই যে একরকম লক্ষণ থাকবে তা নয়। হাইপোগ্লাইসেমিয়ার তীব্রতার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেয়। ঘুমের মধ্যেও হাইপোগ্লাইসেমিয়া হতে পারে। এক্ষেত্রে রোগীরা অতিরিক্ত স্বপ্ন দেখে, ঘাম হয়, কাঁপতে থাকে এবং সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়।

হাইপোগ্লাইসেমিয়া নির্ণয় করা সহজ। কোনো ডায়াবেটিস রোগীর উপরোক্ত লক্ষণ দেখা গেলে প্রথমেই হাইপোগ্লাইসেমিয়া সন্দেহ করা উচিত এবং দ্রুত চিকিৎসাও শুরু করা উচিত।

হাইপোগ্লাইসেমিয়া নির্ণয় করতে পারলে সাথে সাথে রোগীকে চিনি বা চিনিযুক্ত খাবার দিতে হবে। চিনির বা গ্লুকোজের শরবৎ, মিষ্টি, ড্রিংকস, ফলের রস, চকলেট, ইত্যাদি দেওয়া যায়। ১০ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে আবার রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা পরিমাপ করতে হবে। তখন যদি গ্লুকোজের মাত্রা কম থাকে আবার উল্লিখিত খাবার দিতে হবে। এরপর অতি দ্রুত রোগীকে একজন চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে। অনেক সময় বাসায় বা আশেপাশে পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকে না। তখন রোগীকে দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতাল বা ক্লিনিকে নিয়ে যেতে হবে। তবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগে প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে রোগীকে অবশ্যই মিষ্টিজাতীয় খাবার দেওয়া উচিত।

তীব্র হাইপোগ্লাইসেমিয়ার চিকিৎসা কখনই বাসায় করা যাবে না। তীব্র হাইপোগ্লা-ইসেমিয়ার রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে এবং দ্রুত চিকিৎসা শুরু করতে হবে। মাংসপেশীতে গ্লুকাগন ইনজেকশন দিলে দ্রুত রক্তের গ্লুকোজ বেড়ে যায়। শিরায় গ্লুকোজ দিলে রোগী দ্রুত আরাম পায়। রোগী যদি অজ্ঞান থাকে তবে শিরায় গ্লুকোজ দিলে দ্রুত ভালো হয়ে ওঠে।

ডায়াবেটিস রোগীদের যেকোনো সময় হাইপোগ্লাইসেমিয়া হতে পারে। তাই সবারই এবিষয়ে ধারণা থাকা দরকার। চিকিৎসকের উচিত ডায়াবেটিস রোগীদেরকে বিষয়টি সময় নিয়ে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া। রোগীর আত্মীয়স্বজনকেও বিষয়টি বুঝিয়ে দিতে হবে। ডায়াবেটিস রোগীদের বাসায় গ্লুকোমিটার অবশ্যই রাখা উচিত এবং রোগীর আত্মীয়স্বজনদেরও এর ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা থাকা উচিত। গ্লুকোমিটারের দাম খুব বেশি নয় এবং এর ব্যবহারও অত্যন্ত সহজ।

সময়মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করলে হাইপোগ্লাইসেমিয়ার ফলে সৃষ্ট বড় রকমের বিপর্যয় ঠেকানো যেতে পারে। চিনিযুক্ত খাবার খাওয়ানোর মতো সাধারণ পদক্ষেপের মাধ্যমে যেমন রোগীকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব, অপরপক্ষে সময়মতো সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ না-করা হলে রোগীর মৃত্যুও ঘটতে পারে। কাজেই, হাইপোগ্লাইসেমিয়া সম্পর্কে রোগী এবং তার আশপাশের সবাইকে সচেতন থাকতে হবে এবং এই অবস্থায় করণীয় সম্পর্কে সবাইকে ভালোভাবে জানতে হবে। ■

হাম, মাম্পস ও রুবেলা প্রতিরোধে আমাদের করণীয়

ডাঃ রীনা দাস, আইসিডিডিআর,বি

হাম, মাম্পস ও রুবেলা ভাইরাসজনিত তিনটি ছোঁয়াচে রোগ যা মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করে এবং শিশুদের ক্ষেত্রে এসব রোগ স্বাস্থ্য ও জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ। প্রতিবছর পৃথিবীতে প্রায় ১ কোটি মানুষ হামে আক্রান্ত হয়। এদের মধ্যে নানারকম জটিলতার কারণে প্রায় ২ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটে। হামের কারণে ৫ বছরের কমবয়সী শিশুরাই বেশি মৃত্যুবরণ করে। অপরদিকে, বাংলাদেশে প্রতি ১০ লাখে দুই হাজার ৯৭৯ জন রুবেলায় আক্রান্ত হয়।

হাম (Measles)

হাম একটি সংক্রামক রোগ। আরএনএ প্যারামিক্সো ভাইরাস (RNA paramyxo virus)-এর আক্রমণের ফলে এ-রোগ হয়। শিশুদের সংক্রামক রোগের মধ্যে হামই সবচেয়ে মারাত্মক। সাধারণত দুই থেকে পাঁচবছর-বয়সী শিশুদের এ-রোগ বেশি হয়। হাম অনেক সময় সাংঘাতিক জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, শিশুর যদি ভিটামিন 'এ'-র অভাব থাকে, হামে আক্রান্ত হলে পরবর্তীকালে শিশু অন্ধ হয়ে যেতে পারে। এ-রোগে শিশুর মৃত্যুও হতে পারে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিশুর চার মাস থেকে দুই বছর বয়সের মধ্যেই এ-রোগের সংক্রমণ বেশি ঘটে থাকে। তিনমাসের কমবয়সী শিশুদের হাম সচরাচর দেখা যায় না।

হাম শুধু শিশুদেরই নয়, বড়দেরও হতে পারে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং এর চেয়ে বেশি বয়সের মানুষেরও হাম হতে দেখা যায়। জেনে রাখা ভালো, বড়দের হাম হলে শরীরে জটিলতা বেশি হয়। বড়দের হামের কারণে যেসব জটিলতা হতে পারে তা হচ্ছে মারাত্মক নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, কানের সংক্রমণ, ইত্যাদি। এছাড়াও, অনেক সময় মস্তিষ্কের প্রদাহ হতে পারে। গর্ভাবস্থায় মায়েদের হাম হলে গর্ভস্থ শিশুর ওজন কমে যেতে পারে।

হাম যেভাবে ছড়ায়

শিশুদের ক্ষেত্রে হামে আক্রান্ত কোনো শিশুর কাছ থেকে জীবাণুটি বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায় এবং সুস্থ শিশুর শরীরে প্রবেশ ক'রে রোগ সৃষ্টি করে। তবে, সময়মতো টিকা দেওয়া থাকলে এ-রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমে যায়। বড়দের ক্ষেত্রে সাধারণত আক্রান্ত রোগীর হাঁচি-কাশির মাধ্যমে এই ভাইরাস

হাম

আশপাশের সুস্থ মানুষের শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত ব্যক্তির কক্ষে প্রবেশ করলেও সুস্থ যেকেউ হামের জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। তাই এক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

হামের লক্ষণ ও উপসর্গ

হামের ভাইরাসের সুপ্তিকাল ১০ থেকে ১৪ দিন। অর্থাৎ সুস্থ শরীরে ভাইরাস প্রবেশ করার ১০ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে রোগের লক্ষণ ও উপসর্গ প্রকাশ পায়।

- হামে আক্রান্ত হলে প্রথম এক থেকে দুই দিন জ্বর থাকতে পারে এবং তাপমাত্রা ১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইটেরও বেশি হতে পারে
- জ্বর শুরু হওয়ার ৩ থেকে ৫ দিনের মাথায় শরীরের বিভিন্ন অংশে ঘামাচির মতো লাল দানা দেখা দেয়। দানাগুলো প্রথমে কানের পেছনে এবং কপাল ও চুলের সংযোগস্থলে বেশি দেখা যায়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে লাল দানায় সারা শরীর ভরে যায়। হামের লাল দানা ওঠার ৪ দিন আগে থেকে শুরু করে পরবর্তী ৪ দিন পর্যন্ত রোগীর শরীর থেকে হামের জীবাণু অন্যদের মধ্যে ছড়াতে পারে
- আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর ম্যাজম্যাজ করে, নাক দিয়ে পানি ঝরে এবং হাঁচি হয়
- চোখ লাল হয়, চোখ দিয়ে পানি পড়ে এবং আলোর দিকে তাকাতে কষ্ট হয়
- মুখের ভেতর লবণদানার মতো সাদাটে ছোট ছোট দাগ হয়। একে 'কড়' (koplik's spot) বলে। এসময় গলার স্বর ভেঙে যেতে পারে ও কাশি হতে পারে
- হামে আক্রান্ত হলে শিশুরা খাবার খেতে চায় না ও বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়ে

হামের কারণে সৃষ্ট জটিলতা

হামের কারণে সাধারণত যেসব জটিলতা দেখা দেয় সেগুলো হলো মস্তিষ্কের প্রদাহ, মুখের প্রদাহ, অন্ত্রের প্রদাহ, পেটের অসুখ, নিউমোনিয়া, শ্বাসনালির প্রদাহ, চোখের কর্নিয়ার প্রদাহ, কর্নিয়াতে আলসার বা ঘা, কানের প্রদাহ, পুষ্টিহীনতা, শরীরের ওজন মারাত্মকভাবে কমে-যাওয়া, ইত্যাদি। গর্ভাবস্থায় মায়েদের হাম হলে গর্ভপাত ও অকাল প্রসব হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

হামের সঙ্গে যদি নিচের যেকোনো তিনটি উপসর্গ বা চিহ্ন শিশুর দেহে দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে শিশু মারাত্মক জটিল ধরনের হামে আক্রান্ত হয়েছে:

- শিশু বুকের দুধ বা পানি পান করতে পারে না
- যা খায় সবই বমি করে দেয়
- খিঁচুনি হয়
- অজ্ঞান হয়ে যায় বা খুব দুর্বল হয়ে পড়ে
- চোখের মণিতে ঘোলাটে ভাব দেখা যায়
- নিউমোনিয়া হয়
- পাতলা পায়খানা ও পানিশূন্যতা থাকে
- শ্বাস-প্রশ্বাসে শোঁ শোঁ শব্দ শোনা যায়
- মারাত্মক অপুষ্টিতে আক্রান্ত হয়

হাম হলে করণীয়

১. হামে আক্রান্ত রোগীকে অন্যদের কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে হবে। জ্বর না-কমা পর্যন্ত রোগীকে বিছানায় পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে। এ সময় প্রচুর তরল ও পুষ্টিকর খাবার খেতে

হবে। রোগীকে অবশ্যই সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে

২. তীব্র হামে আক্রান্ত শিশুকে অবশ্যই হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা দিতে হবে

৩. হামে আক্রান্ত শিশুকে ভিটামিন 'এ' দিতে হবে যদি না শিশুটি এক মাসের মধ্যে প্রতিরোধক 'এ' ভিটামিনের ডোজ পেয়ে থাকে। জ্বর যদি ১০২ ডিগ্রির উপরে যায় এবং এতে শিশু বেশ কষ্ট পাচ্ছে বলে মনে হয়, তবে প্যারাসিটামল দিতে হবে। জ্বর যদি তিন-চার দিনের বেশি থাকে, তবে ধরে নিতে হবে আরো কোনো সংক্রমণ হয়ে থাকতে পারে। এক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করা লাগতে পারে

৪. আক্রান্ত শিশুকে বুকের দুধের পাশাপাশি স্বাভাবিক খাবার খাওয়ানো অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে। মুখে যদি ঘা থাকে তার চিকিৎসা দিতে হবে

৫. হামের সঙ্গে নিউমোনিয়া, কানপাঁকা, ডায়রিয়া, রক্ত আমাশয়, খিঁচুনি, মারাত্মক পানিশূন্যতা ইত্যাদি থাকলে তার চিকিৎসাও করাতে হবে

৬. হাম হলে কখনো কখনো পুরোপুরি সেরে উঠতে কয়েক সপ্তাহ বা মাস লেগে যায়। এসময় আক্রান্ত শিশু বারবার অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে এবং দীর্ঘস্থায়ী নিউমোনিয়া বা ডায়রিয়ার শিকার হতে পারে। তাই পুরোপুরি সেরে না-ওঠা পর্যন্ত চিকিৎসকের পরামর্শ মতো চলতে হবে

হাম প্রতিরোধে করণীয়

চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধই শ্রেয়। শিশুর বয়স ৯ মাস হলে তাকে নিকটস্থ হাসপাতাল থেকে এক ডোজ হামের টিকা দিলে সে পরবর্তীকালে হামের ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকবে। হামে আক্রান্ত হলে সতর্ক থাকতে হয়। সতর্কতা অবলম্বন না-করলে বিভিন্ন জটিলতা দেখা দিতে পারে, এমনকি শিশুর মৃত্যুও হতে পারে।

মাম্পস (Mumps)

প্যারামিক্সো (paramyxo) গ্রুপের ভাইরাস এ-রোগ সৃষ্টি করে। রোগটি সাধারণত ১৫ বছর বয়সের মধ্যে বেশি হয়। ঘিঞ্জি পরিবেশে এর প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়। বছরের যেকোনো সময় মাম্পস হতে পারে, তবে শীতের শেষে ও বসন্তকালে বেশি হয়।

মাম্পস যেভাবে ছড়ায়

মাম্পস-আক্রান্ত রোগীর সরাসরি সংস্পর্শ, হাঁচি-কাশির মাধ্যমে অথবা লালা বা প্রস্রাবে দূষিত ব্যবহৃত জিনিসপত্রের সাহায্যে ছড়ায়। রোগী অসুস্থ হওয়ার কয়েকদিন আগে থেকে অসুখ সেরে যাওয়ার কিছু দিন পর পর্যন্ত জীবাণু ছড়ায়। সাধারণভাবে মাম্পস ভাইরাসটি দেহে প্রবেশের পর শ্বাসতন্ত্রের টিস্যুতে সাময়িকভাবে বংশবৃদ্ধি ঘটায়। পরে রক্তে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আক্রমণ করে। এই ভাইরাসের প্রধান টার্গেট পেরোটিড ও অন্যান্য লালাগ্রন্থি।

মাম্পস এর লক্ষণ ও উপসর্গ

মাম্পস জীবাণু দেহে ঢোকার ১৪ থেকে ২৪ দিনের মাথায় অসুখের লক্ষণ দেখা যায়।

১. প্রথমদিকে জ্বর, মাথাব্যথা ও সারা শরীরে ব্যথা থাকে। সাধারণত জ্বরের মাত্রা তেমন বেশি হয় না

২. এক থেকে তিন দিনের মধ্যে মূল লক্ষণ প্রকাশ পায়, অর্থাৎ একদিক বা দু'দিকের পেরোটিড লালাগ্রন্থি (যা কানের ঠিক সামনে থাকে) ফুলে যায় এবং খুব ব্যথা হয়। একই সঙ্গে দু'দিকের গ্রন্থি না-ও ফুলতে পারে। সাধারণত একটি ফুলে যাওয়ার দু-তিন দিনের মাথায় অন্যটি ফুলে থাকে। পাঁচ থেকে সাত দিন এই ফোলা ভাব থাকতে পারে

মাম্পস

মাম্পস-এর কারণে সৃষ্ট জটিলতা

সাধারণভাবে তেমন কোনো জটিলতা ছাড়াই বেশির ভাগ মাম্পস রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে। তবে, অনেক সময় কিছু মারাত্মক জটিলতাও দেখা দিতে পারে, যেমন:

- অণ্ডকোষের প্রদাহ
- ডিম্বকোষের প্রদাহ
- অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ
- মস্তিষ্কের আবরণীর প্রদাহ
- মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, কিডনি প্রভৃতির প্রদাহ
- বধিরতা

শিশুদের মেনিনজাইটিস এবং এনকেফালাইটিসের অনেকগুলোই মাম্পস-এর জীবাণুঘটিত, যেক্ষেত্রে প্রায়ই মাম্পসের সুনির্দিষ্ট লক্ষণ থাকে না। কানে না-শোনার অন্যতম প্রধান কারণও হচ্ছে মাম্পস-পরবর্তী জটিলতা।

মাম্পস হলে করণীয়

এ-রোগের কোনো সুনির্দিষ্ট ওষুধ নেই, ব্যবস্থাপনাই আসল। মাম্পস হলে স্বাভাবিক খাবার বজায় রাখা, খাবারের পুষ্টিগুণ অটুট রেখে রোগীকে খাওয়ানো, জ্বরের জন্য প্রয়োজনমতো প্যারাসিটামল দেওয়া, শরীরে পানির চাহিদা পূরণ করা এবং শিশুদের ক্ষেত্রে কোনো জটিলতা দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে শিশু-বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

রুবেলা/জার্মান হাম (German measles)

রুবেলাও এক ধরনের হাম। রুবেলা রোগটিকে অনেকে জার্মান হামও বলে থাকেন। রুবেলা একটি সংক্রামক রোগ। এ-রোগে র‍্যাশ (ফুসকুড়ি) ওঠে আর গলার পাশে কানের লতির পেছনের গ্রন্থি ফুলে যায় ও ব্যথা অনুভূত হয়। গর্ভধারণের তিন মাসের সময় রুবেলা ভাইরাস আক্রমণ করলে ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে মা থেকে গর্ভের শিশু এ-রোগে আক্রান্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে গর্ভপাত, এমনকি গর্ভের শিশুর মৃত্যুও হতে পারে। এছাড়াও গর্ভস্থ শিশুটি চোখে ছানি বা হৃৎপিণ্ডের ত্রুটি নিয়ে অথবা বধির, মানসিক প্রতিবন্ধী ও শারীরিক প্রতিবন্ধী হয়েও জন্ম নিতে পারে। একটু বেশি বয়সের শিশুর শরীরেও রুবেলা সংক্রমণের মারাত্মক লক্ষণ দেখা যেতে পারে। তাই এ-রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকা নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

রুবেলা যেভাবে ছড়ায়

রুবেলা আরএনএ (RNA) ভাইরাসের মাধ্যমে ছড়ায়। এ-রোগের জীবাণু প্রধানত বাতাস থেকে শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে সুস্থ শরীরে প্রবেশ করে। গর্ভবতী মায়েরা গর্ভধারণের প্রথম তিন মাসের সময় রুবেলা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে গর্ভস্থ শিশুটি রুবেলায় আক্রান্ত হতে পারে এবং শিশুটি জন্মগত জটিলতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, যা কনজেনিটাল রুবেলা সিনড্রোম (congenital rubella syndrome) নামে পরিচিত।

রুবেলার লক্ষণ ও উপসর্গ

এ-রোগের লক্ষণ ও উপসর্গগুলো হামের মতোই। এটি প্রায় ফ্লু-র মতো সংক্রামক। শিশুদের মধ্যে এটি সাধারণত খুব হালকা ধরনের হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে কোনো লক্ষণ ছাড়াই ভালো হয়ে যায়। শরীরে জীবাণু প্রবেশের ১৪ থেকে ২১ দিনের মধ্যে উপসর্গ দেখা দেয়। হামের তুলনায় এ-রোগে প্রাথমিক উপসর্গ অনেক ম্লান থাকে। এ-রোগের প্রধান লক্ষণ হলো শরীরে লাল রঙের দানা দেখা-দেওয়া। প্রথমে দানা মুখমণ্ডলে দেখা দেয় এবং পরে পাঁচ-সাতদিনের মধ্যে সারা শরীরে দেখা যায়। এছাড়াও, আক্রান্ত ব্যক্তি জ্বর, সর্দি, কাশি, গলাব্যথা, চোখ লাল-হওয়া, হাড়ের জোড়া ও মাংসপেশিতে ব্যথা, বমি-হওয়া, গ্রন্থি-ফোলা এবং বিশেষ করে ঘাড়ের গ্রন্থির সমস্যায় ভুগতে পারে।

রুবেলার ফলে সৃষ্ট জটিলতা

এ-রোগের জটিলতা শিশুদের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে বেশি হয়। এগুলো হলো:

- সন্ধিবাত (আর্থ্রাইটিস)
- মস্তিষ্কের প্রদাহ
- নাক দিয়ে রক্ত-পড়া
- প্রস্রাবে রক্ত-যাওয়া
- খাদ্যনালিতে রক্ত-আসা

গর্ভাবস্থায় আক্রান্ত হলে গর্ভস্থ শিশুর নিম্নোক্ত জন্মত্রুটি দেখা যায়:

- নবজাতকের ত্রুটিপূর্ণ চোখের গঠন

রুবেলা

- বধিরতা
- জন্মগত হৃদরোগ
- মানসিক ভারসাম্যহীনতা
- শারীরিক প্রতিবন্ধকতা

রুবেলা হলে করণীয়

এই অসুখটির চিকিৎসা বলতে উপসর্গ লাঘবকেই বোঝায়, যেমন জ্বর নিয়ন্ত্রণে রাখা, ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ দেখা দিলে অ্যান্টিবায়োটিক সেবন, পুষ্টিমান রক্ষা করা, ইত্যাদি।

রুবেলা প্রতিরোধে করণীয়

এ-রোগ প্রতিরোধের জন্য শিশুর বয়স ৯ মাস হলে এক ডোজ এমআর (মিজেলস-রুবেলা) টিকা ও ১৫ মাস পূর্ণ হলে হামের দ্বিতীয় ডোজ টিকা দিতে হয়। কিশোরীদের বয়স ১৫ বছর পূর্ণ হলে এক ডোজ এমআর টিকা এক ডোজ টিটি টিকার সঙ্গে দিতে হবে। পরবর্তী পাঁচ ডোজ টিটি টিকা সময় অনুযায়ী শেষ করতে হবে। রুবেলা রোগ বা জার্মান হাম সম্পর্কে মায়েদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং সময়মতো টিকা দিতে হবে। রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে অথবা ক্যান্সার বা যক্ষ্মায় আক্রান্ত শিশু-কিশোরীকে এমএমআর (মিজেলস-মাম্পস-রুবেলা) টিকা দেওয়া যাবে না। ১৫ মাস বয়স থেকে প্রাক-যৌবনে এবং গর্ভবতী নয় এমন মহিলাদের রুবেলার টিকা দিলে প্রায় ৯৮ শতাংশ ক্ষেত্রে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জিত হয়। গর্ভধারণে সক্ষম মহিলাকে টিকা দেওয়ার তিন মাসের মধ্যে গর্ভধারণ অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে। গর্ভাবস্থায় কখনোই এই টিকা দেওয়া যাবে না। রুবেলা প্রতিষেধক টিকা শিশুর ১৫ মাস বয়সে এমএমআর টিকা দেওয়ার মাধ্যমে নিশ্চিত করা যায়। সাধারণত নবজাতকের ১ বছর বয়স হলে এই টিকা দেওয়া যায়। অনেক সময় ৯-১০ মাসেও এই টিকা দেওয়া হয় তবে সেক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। ১ম ডোজ থেকে ২য় ডোজের ব্যবধান ৩ মাস হলে ভালো। তবে, কমপক্ষে ৪ সপ্তাহ ব্যবধানে নিতে হবে। যদি এই বয়সে এই টিকা নেওয়া না-হয়ে থাকে, তবে আপনি এবং আপনার পরিবারের সবাই এই টিকা যেকোনো সময় নিতে পারবেন। বিশেষ করে প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা, যারা আগে এই টিকা নেয়নি তারা একটি ডোজ গর্ভধারণের তিনমাস আগে নিতে পারবে। সকল মেয়ে-শিশু এবং মহিলাদের গর্ভধারণের আগেই রুবেলার টিকা নেওয়া উচিত।

এমএমআর টিকা গ্রহণের মাধ্যমে এই তিনটি রোগ প্রতিরোধ করা যায়। রুবেলা নিয়ে কোনো শিশু যাতে জন্ম না নেয় এবং হাম, রুবেলা ও মাম্পসে আক্রান্ত হয়ে যাতে কোনো শিশু আর মারা না যায় সেজন্য ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩ থেকে সরকার বিনামূল্যে এমএমআর টিকা দিতে শুরু করেছে। এই তিনটি রোগ প্রতিরোধ করতে সকলেরই বয়স অনুযায়ী এই টিকা নেওয়া জরুরি। ■

ডায়াবেটিস রোগীদের পায়ের যত্ন

ডাঃ শাহানা পারভীন, আইসিডিডিআর,বি
ডাঃ শামসুল আরেফিন, আইসিডিডিআর,বি

দীর্ঘদিন ধরে আক্রান্ত ডায়াবেটিস রোগীদের ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে না-থাকলে পায়ের অনুভূতিশক্তি কমে যেতে পারে। এ-অবস্থায় ডায়াবেটিস রোগীরা তাদের পায়ের নিচে শক্ত পাথর কণা পড়লে বা ফোঁড়া উঠলে তা অনুভব করতে পারে না এবং তখন তাদের পায়ে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়াও, ডায়াবেটিস রোগীদের পায়ে রক্ত চলাচল কমে যেতে পারে যা পরবর্তীতে পায়ের বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

কোনো ডায়াবেটিস রোগীর যদি পায়ের অনুভূতিশক্তি কমে যায় (অবশ-ভাব এবং সুড়সুড়ির অনুভূতি),

এবং/অথবা পা/পায়ের আঙুলের আকার পরিবর্তন হয়ে যায় এবং/অথবা পা কেটে যায় এবং কাটা স্থানের ঘা বা ক্ষত না-শুকায়, তাহলে তাকে অনতিবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা নিতে হবে এবং পায়ের যত্ন করতে হবে। একজন ডায়াবেটিস রোগী যদি দৈনিক তার পায়ের যত্ন নেয় তাহলে পায়ের আঙুল, পায়ের পাতা বা পা হারানোর ঝুঁকি বাড়ায় এমন পচনশীল ক্ষত প্রতিরোধ করতে পারে। এছাড়া রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণে রাখাটাও জরুরি।

প্রতিদিন পা পরীক্ষা করুন

- পায়ে কাটা, ক্ষত, ফোলা, লাল হয়ে-যাওয়া বা পায়ের কোনো আঙুলে/নখে সংক্রমণ হয়েছে কি না তা দৈনিক পরীক্ষা করুন
- সারাদিনের কাজ শেষে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পা থেকে জুতো খোলার পর পা পরীক্ষা করুন
- লক্ষ করুন দুই পায়ের মধ্যে আকৃতি, রঙ বা তাপমাত্রার (ঠাণ্ডা/গরম) কোনো পার্থক্য আছে কি না

আপনার যদি সামনে ঝুঁকে নিজের পা পরীক্ষা করতে সমস্যা হয়, তবে আপনি আয়না ব্যবহার করতে পারেন অথবা আপনার পরিবারের কোনো সদস্যের সাহায্য নিতে পারেন।

দৈনিক পা পরিষ্কার করুন

- কুসুম-গরম পানি ও সাবান দিয়ে প্রতিদিন পা পরিষ্কার করুন। খেয়াল রাখুন পানি যেন খুব বেশি গরম না হয়। প্রয়োজনে থার্মোমিটার ব্যবহার করুন (৯০-৯৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা হলে নিরাপদ)
- পায়ের আঙুলের মধ্যবর্তী ত্বক শুষ্ক রাখতে এবং সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে প্রয়োজনে ট্যালকম পাউডার ব্যবহার করুন। পা ভেজা থাকলে শুকনো কাপড় দিয়ে ভালোভাবে মুছে নিন

পায়ের ত্বক নরম ও মসৃণ রাখুন

- খুব অল্প পরিমাণে লোশন, ক্রিম বা পেট্রোলিয়াম জেলি পায়ের উপরে এবং নিচে লাগান
- পায়ের আঙুলের মধ্যবর্তী ত্বকে লোশন বা ক্রিম লাগাবেন না কারণ তাতে সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে

কর্ন বা ক্যালাস মসৃণ রাখুন

- পুরু বা শক্ত হয়ে-যাওয়া ত্বক বা আঁচিলের মত বর্ধনশীল ত্বককে কর্ন বা ক্যালাস বলে। আপনার পায়ে কর্ন বা ক্যালাস থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
- কোনো অবস্থাতেই ব্লেড বা রেজর দিয়ে কর্ন বা ক্যালাস কাটবেন না

নিয়মিত পায়ের নখ কাটুন

- নিয়মিত পা ধুয়ে এবং শুকিয়ে নখ কাটার যন্ত্র দিয়ে পায়ের নখ কাটুন। তবে, সামান্য নখ রেখে কাটুন
- আপনার পায়ের নখ যদি পুরু বা হলুদ হয়ে যায় অথবা পার্শ্ববর্তী ত্বকের ভিতর ঢুকে যায়, তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

ডায়াবেটিস রোগীর পায়ের যত্ন

সবসময় জুতা এবং মোজা পরুন

- সবসময় জুতা-মোজা পরুন। ঘরের ভিতরে বা বাইরে কখনোই খালি পায়ে হাটবেন না
- জুতা পরার আগে এর ভিতরটা দেখে নিন। জুতার ভিতরের অংশ মসৃণ কি না বা এর ভিতরে কোনো বস্তু আছে কি না তা লক্ষ রাখুন
- আরামদায়ক এবং সুরক্ষিত সঠিক মাপের জুতা ব্যবহার করুন
- রাতে পায়ে ঠাণ্ডা ভাব অনুভূত হলে মোজা পরুন

পায়ের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রাখুন

- বসে কাজ করার সময় পায়ের নিচে টুল রেখে পা উঁচুতে রাখুন
- দীর্ঘসময় এক পায়ের উপর অন্য পা ভাঁজ করে বসবেন না
- পায়ে টাইট মোজা, ইলাস্টিক বা রাবার ব্যান্ড ব্যবহার করবেন না
- ধুমপান করবেন না। ধুমপান পায়ে রক্ত চলাচল কমিয়ে দিতে পারে
- পায়ে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি করতে নিজেকে কর্মঠ রাখুন। দৈনিক হাঁটতে, সাঁতার কাটতে অথবা সাইকেল চালাতে পারেন

আপনার পায়ের জন্য উপযুক্ত জুতা নির্বাচনে কিছু পরামর্শ

- পা ভালো রাখার জন্য সঠিক মাপের জুতা পরা জরুরি। Walking shoes বা athletic shoes দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য ভালো। এগুলো পায়ে বাতাস চলাচলে সাহায্য করে
- কখনোই প্লাস্টিকের তৈরি জুতা পরবেন না, কারণ এগুলোর সংকোচন-প্রসারণ হয় না বা এর ভিতরে বাতাস চলাচল করে না
- জুতা কেনার সময় লক্ষ রাখুন যেন তা আরামদায়ক হয় এবং তাতে পায়ের আঙুলের জন্য যথেষ্ট জায়গা থাকে
- উঁচু হিল বা সরু অগ্রভাগবিশিষ্ট জুতা পরবেন না কারণ এগুলো পায়ের আঙুলের ওপর অনেক চাপ সৃষ্টি করে
- যদি আপনার এক পা অন্য পায়ের থেকে বড় হয়, তবে যে পা বড় সেই পায়ের মাপে জুতা কিনুন। ছোট পায়ের জন্য প্রয়োজনে জুতার ভিতর অতিরিক্ত সুকতলা ব্যবহার করুন
- বাজারে ডায়াবেটিস রোগীর জুতা পাওয়া যায়, সম্ভব হলে সেটা ব্যবহার করুন

সঠিক যত্নই ডায়াবেটিস রোগীদের পায়ের সংক্রমণ, গ্যাংগ্রিন বা পচনের মতো বিভিন্ন জটিলতা প্রতিরোধ করতে পারে। ■

স্বাস্থ্য সংলাপে লেখা আহ্বান
যেকেউ স্বাস্থ্য সংলাপে লেখা দিতে পারেন। স্বাস্থ্যসম্পর্কিত যেকোনো মানসম্মত লেখা আমরা স্বাস্থ্য সংলাপে ছাপাতে পারি। লেখা সম্পর্কে ধারণা নিতে http://www.icddrb.org/shasthyasanglap লিংকটিতে স্বাস্থ্য সংলাপের পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলো দেখুন। লেখা পাঠাবার ঠিকানা: hasib@icddrb.org।